বাবরের প্রার্থনা

শঙ্খ ঘোষ

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত---
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

.

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

.

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান ;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

.

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

.

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?

.

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

শঙ্খ ঘোষ (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ -) একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি কবি ও সাহিত্য সমালোচক। তিনি একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ। তার প্রকৃত নাম **চিত্তপ্রিয় ঘোষ।** যাদবপুর, দিল্লি ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনাও করেছেন। *বাবরের প্রার্থনা* কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ২০১১ সালে কবিকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। ২০১৬ খ্রিঃ লাভ করেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান ,জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, এ আমির আবরণ, উর্বশীর হাসি, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ* ইত্যাদি।

প্রাথমিক জীবন

শঙ্খ ঘোষ এর আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। তার পিতা মনীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মাতা অমলা ঘোষ। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুরে জেলায় ১৯৩২ খ্রি ৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিকভাবে পৈত্রিক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামে। শঙ্খ ঘোষ বড় হয়েছেন পাবনায়। পিতার কর্মস্থল হওয়ায় তিনি বেশ কয়েক বছর পাবনায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় কলা বিভাগে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে অবসর নেন। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইওয়া রাইটার্স ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়,শিমলাতে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ আডভান্স স্টাডিজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্ধ 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬) এছাড়াও 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়' 'তুমি তো তেমন গৌরি নও', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'

পুরস্কার -

- ১৯৭৭ খ্রিঃ "মূর্খ বড়, সামাজিক নয়" নরসিংহ দাস পুরস্কার।
- ১৯৭৭ খ্রিঃ "বাবরের প্রার্থনা" র জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার।
- ১৯৮৯ খ্রিঃ "ধুম লেগেছে হৃদকমলে" রবীন্দ্র পুরস্কার
- সরস্বতী পুরস্কার "গন্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ"
- ১৯৯৯ খ্রিঃ "রক্তকল্যাণ" অনুবাদের জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার
- ১৯৯৯ খ্রিঃ বিশ্বভারতীর দ্বারা দেশিকোত্তম পুরস্কার
- ২০১১ খ্রিঃ ভারত সরকারের পদ্মভূষণ পুরস্কার।
- ২০১৬ খ্রিঃ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

বাবরের প্রার্থনা । Prayer of Babur.

- ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতাটি রচনাকাল ১৯৭৪ সাল। ১৯৭৭ খ্রিঃ "বাবরের প্রার্থনা" র জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পান। কবিতাটি ৬টি স্তবকে, ২৪ টি পংক্তিতে, এক বিবেকী সংবেদনশীল কবির অনুভূতিশীল মনের ছোঁয়ায় আমাদের মুগ্ধ করে। ১৯৭৪ সাল বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক নীরেট দুঃস্বপ্নের কাল। সারাদেশ জরুরি অবস্থা, চারিদিকে দম বন্ধ করা এক কালো ছায়া। তরুণ যুব সমাজ অতি ভয়ঙ্কর রক্তস্নাত রাত্রির বিভীষিকায় দিশাহারা। দেশের রাজনীতি তার করাল থাবা মেরে গ্রাস করেছে মানুষের স্বাভাবিক দিনগুলিকে। যেখানে-সেখানে গুপ্তহত্যা, হিংসা, গুপ্তঘাতকের ছুরি ঝলসে উঠেছিল। গোটা সমাজটাই দিশাহারা, যেন অসুস্থ রোগের প্রকোপে শুয়ে আছে মৃত্যুশয্যায়। এরূপ এক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে কবির ব্যক্তি-জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৪ সালের হেমন্তের সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবেই জন্ম হয়েছে এই অসাধারণ কবিতাটির।

‘কবিতার প্রাক-মুহূর্ত’ নামক গ্রন্থে আমরা জেনেছি যে কবির কন্যা কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন । চিকিৎসা-বিভ্রাটে দিনে-দিনে তার রোগ আরও বেড়ে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে তার লাবণ্য; অথচ এই কিশোরী মেয়েটির তখন ফুলের

মতো ফুটে ওঠার বয়স। তাই কবির মন খুবই বিষন্ন , কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না । সেরকম এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্জন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পদচারণা করতে করতে কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা । মুঘল সম্রাট বাবর -এর পুত্র হুমায়ুন যখন কিছুতেই সুস্থ হচ্ছেন না , তখন বাবর একদিন নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছে , পুত্র হুমায়ূনের আরোগ্য কামনা করে। তারপর ধীরে ধীরে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সম্রাট বেশিদিন বাঁচেন নি। এই ছোট্ট ঐতিহাসিক তথ্যটির এক নব -তাৎপর্য দান করলেন আলোচ্য কবিতাটিতে।

পিতার প্রার্থনা , গুরুজনদের আশীর্বাদ ও মঙ্গলকামনায় কোন পুত্র বা পুত্রসম স্নেহজনদের আরোগ্যলাভ ঘটে কিনা , তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সাপেক্ষ হলেও , মানুষের সত্য -কামনায়, সত্যনিষ্ঠায় ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় যে মনের জোর সৃষ্টি হয় , তারই বরে মানুষ কখনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থগুলিতে এরূপ অনেক ঘটনার কথা আছে যেগুলিকে অলৌকিক বলে উড়িয়ে না দিয়ে যদি এইভাবে ভাবতে পারি যে, শুধু বিশ্বাসের দ্বারা অসাধ্যকে সাধন করেছেন। এই যুগে এই সেদিন মাদার টেরেসার অলৌকিক শক্তির কথা খ্রিস্টান সমাজ সারা বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের সামনে স্বীকার করেছেন । হয়তো কিছুটা ঘটনা , কিছুটা বিশ্বাস মিলিয়ে তৈরি হয় মিথগুলি । হুমায়ূনের জন্য বাবরের ঐকান্তিক প্রার্থনার সত্যটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ প্রার্থনা জানিয়েছেন পরম শক্তিমানের কাছে কন্যার রোগমুক্তির।

কবিতাটির বৈশিষ্ট্য হলো , এখানে ব্যক্তি মানুষের প্রার্থনা সারা পৃথিবীর অসুস্থ মানুষের রোগ মুক্তির প্রার্থনার প্রতীক হয়ে উঠেছে । চারিদিকে অশান্ত, অচরিতার্থ প্রাণ। প্রায় নিঃশেষিত ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত বিনা অপরাধে প্রাণ দিচ্ছে শত শত তরুণ যুবক তাদের বিশ্বাস কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। প্রতিদিন পুলিশের গুলিতে বা ঘাতকের ছুরিতে রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেশ । দেশের যুব সমাজ আজ অসুস্থ বাবরের পুত্রের মতো , মৃত্যুর প্রহর গুনে চলেছে। শুধু কবির নয়, যেকোন পিতার যে কোন পুত্র আজ রোগশয্যায় । কবি একজন স্নেহময় পিতারূপে তাদের সকলের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন । তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়ে সেই তরুণ-যুবকদের জীবন লাভ ঘটুক।

“এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।”

শত-সহস্র তরুণ-তরুনীর জন্য কবি কাতর । শত-শত শুষ্ক মুখের ঘুরে বেড়ানো ছাত্রদের জন্য উদ্বিগ্ন কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর অনুভূতিশীল মনে তাদের কষ্টকে ভুলতে পারেননি বলেই নিজের কন্যার কথা ভাবতে ভাবতে তার চিন্তার সরণিতে এসে পৌঁছেছে সম্রাট বাবরের কথা , আরও বৃহত্তর ভাবে সমগ্র দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের কথা । যেমন সন্ত্রাসবাদের যুগে মানসিক যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

“আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।”

সেই যন্ত্রণা, সেই আবেগ, কবি শঙ্খ ঘোষকেও স্পর্শ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে এই সরলমতি যুবসমাজ আজ যে দিশাহারা, মৃত্যুর মুখোমুখি, অসুস্থ, তার জন্য তাদের কোন দায় নেই । পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে । সভ্যতা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ নারকীয় গতিতে ধ্বংস করতে আসছে মানুষের জীবনকে । দুর্নীতি, পাপ, অন্যায়, শঠতায় ছেয়ে গেছে দেশ। সকলের শুদ্ধচৈতন্যের জাগরন না ঘটলে এই যুব সমাজ কি করে মুক্তি পাবে!

“নাকি এ শরীরে পাপের বীজাণুতে
কোন প্রাণ নেই ভবিষ্যতের
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যুকে ডেকে আনি নিজের ঘরে।”

যদি মানুষ নতজানু হয়ে প্রার্থনায় না বসে, যদি পাপ হিংসা লোভ কে জয় করে শুদ্ধ চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে না পারে, তবে একদিন এই বর্বর আগুনের ঝলসানিতে সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে । অথচ কোন পিতা , কোন বিবেকবান মানুষ তা চান না । তাই কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে তিনি নিজেকে নিঃশেষ করতে চান , নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে আত্মজকে রক্ষা করতে চান।

“ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।”

সমাজ-সচেতন মানবতাবোধের দলিল হিসাবে কবিতাটি সার্থক হয়েছে।